জীবনী-সাহিত্য

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

Have trust, ye men of little faith. Lovers' quarrels die; the works inspired by love remain. There is room still in this world for tenderness and beauty.''--- 'the Life of George Sand' : Maurois

প্রতিকৃতি-অঙ্কন যেমন চিত্রকলার এক অনবদ্য প্রকাশ, জীবনী-সাহিত্যও তেমনভাবে এক অনুপম শিল্পরূপ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে একজন জীবনীকার কোনও সতর্ক ঐতিহাসিকের মতো নিষ্ঠাবান হবেন না। তাঁর প্রথম কর্তব্য অবশ্যই যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে অবগত-হওয়া যা তাঁর বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ ছিল এমন বহু গৌণ চরিত্র-সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই কাল-বিষয়ক ইতিহাস এবং অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্রের দিনলিপি, চিঠিপত্র, সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা, জীবিত সাক্ষীদের বক্তব্য ইত্যাদির পাঠ ও শ্রবণ তাঁর পক্ষে আবশ্যক। জীবনীর সংজ্ঞা-রূপে ড্রাইডেন বলেন ''History of particular men's lives''. এই ইতিহাস রচনার জন্য জীবনীকারকে যেতে হয় হাজারো রচনার উৎস-সন্ধানে। সরকারি পাঠাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে লুকিয়ে থাকে বহু অপ্রকাশিত দলিল। খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার থেকেও আকুলভাবে জীবনীকারকে খুঁজতে হয় সে-সব। জর্জ সাঁ-র জীবনী রচনার সময়ে আঁদ্রে মরোয়া আবিষ্কার করেন যে জর্জ সাঁ-র লেখা বহু চিঠি এবং যে-সব চিঠি লেখা হয়েছিল তাঁকে আর সেই সঙ্গে তাঁর 'জর্নাল' তখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। ভিক্তর উগোকে নিয়ে লেখা হয়ে গেছে পাঁচশোরও বেশি বই। তবু তাঁর অপ্রকাশিত রচনা ও অন্যান্য নথিপত্রের সংখ্যা তাঁর প্রকাশিত রচনার থেকে বেশি।

সার্থক জীবনীকার মাত্রই জানেন এই নথিপত্র-সন্ধান বিপুল পরিশ্রম সাপেক্ষ হওয়া-সত্ত্বেও কী পরিমাণ তৃপ্তিদায়ক অভিযান। ধরা যাক, আপনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখতে বসেছেন। আপনার জানা আছে এমন একজন ভদ্রমহিলার কথা যাঁর প্রপিতামহের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্র বিনিময় ঘটত নিয়মিত, কিন্তু সেইসব চিঠি কখনও ছাপা হয়নি কোথাও। চিঠিগুলি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে সূত্র মিলতে পারে কোনও, কিংবা ভাগ্য ভালো থাকলে তিনি হয়তো পরম যত্নে 'পরিবারিক সম্পদ'-রূপে সে-সব চিঠি রেখে দিতে পারেন গোপন ঝাঁপিতে। বহু সাধ্য-সাধনার পর সেগুলি যদি আপনার হাতে এসে পৌঁছোয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে তেমন কোনও নতুন মাত্রা যুক্ত না-ও হতে পারে, কিন্তু আপনি যে এক সুদীর্ঘ অনুসন্ধানের শেষে অনাবিল পরিতৃপ্তি অনুভব করবেন, তা নিশ্চিত।

ভিক্তর উগোর জীবনী-পাঠকের অজ্ঞাত নয় যে প্রাণোচ্ছল ও লাবণ্যময়ী মাদাম বিয়ারকে লেখা উগোর প্রেমপত্রগুলি মাদাম বিয়ার চারিত্রিক চপলতাবশত পাঠিয়ে দেন জুলিয়েৎ দ্রুয়ে-কে (উগোর আজীবন বান্ধবী, চিঠিগুলি হাতে আসার সময় তাঁর বয়স চল্লিশের শেষ ধাপে)। সেগুলি নিয়ে কী করেন জুলিয়েৎ? ঈর্ষাবশত তিনি পুড়িয়ে ফেলতেই পারতেন সে-সব প্রেমপত্র, কিন্তু সেটা ছিল তাঁর পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক, যেহেতু উগো-রচিত যে-কোনও কিছুই ছিল তাঁর কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঘটনা এই যে জুলিয়েৎ দ্রুয়ে সেই চিঠিগুলি (নিজের যাবতীয় দলিলপত্রসহ) দিয়ে যান ভ্রাতুষ্পুত্রকে, যিনি সঙ্গে সঙ্গে সে-সব চিঠি উগোর উইল-নির্বাহকের হাতে তুলে দেন। তাঁরই পৌত্র-মারফত চিঠিগুলির সন্ধান পান আঁদ্রে মরোয়া।

এরকম দৃষ্টান্ত অনেক। জীবনীকারকে তাই কর্ষণ করতে হয় যাবতীয় ক্ষেত্র, মেলাতে হয় যাবতীয় তথ্য, খতিয়ে দেখতে হয় যাবতীয় নথিপত্র। আমরা দেখতে চাই তিনি তাঁর দাবিগুলি প্রমাণ-সহযোগে উপস্থাপিত করছেন এবং আমাদের সামনে তুলে ধরছেন প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্তসমূহ। যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-জ্ঞাপনের সময়ে তিনি জানাবেন সেগুলির উৎস, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের নিঃসংশয় করে তুলবেন তাঁর গবেষণার সারবত্তা-সম্পর্কে। একটা সময় ছিল যখন আমি পাদটীকা সম্পর্কে বীতরাগ ছিলুম। তখন মনে হতো পাদটীকার উপস্থিতি মূল পাঠের প্রতিবন্ধক। কিন্তু পরে দেখেছি, পাদটীকা যদি যথাযথরূপে ছাপানো যায় তবে পাঠের প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাকুক, পাঠককে সে উজ্জীবিত ও চালিত করে আনুষঙ্গিক বিষয় ও তথ্য-আহরণে। সহজ কথায়, একজন সৎ জীবনীকারকে হতে হবে যথার্থরূপে পণ্ডিত।

বিশদভাবে গবেষণা-পর্ব পরিসমাপ্ত হলে (অর্থাৎ তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব) শু হয় একজন জীবনীকারের প্রকৃত কাজ। এতক্ষণে শেষ হয় তাঁর ঐতিহাসিক ও গবেষক-সত্তার দায়িত্ব।১ এবার মঞ্চে প্রবেশ করেন শিল্পী। আঁদ্রে মরোয়ার মতে 'জীবনী-সাহিত্যিকদের যুবরাজ' লিটন স্ট্র্যাচি একবার বলেছিলেন, একগাদা নথিপত্রের তাড়া মানেই একটি জীবনী হতে পারে না, ঠিক যেমনটি অগুনতি ডিমের পাহাড়কে বলা চলে না একটি অমলেট। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'যাত্রী' (১৯২৯) গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

''যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে, তা হলে মৃতচরিতের কবরটা নিয়ে হবে কী। আমি যদি বোকামি করে

প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।

"যে-যুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করে নি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেত না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুষদের পেয়েছে। এখন হতে আমরা তথ্য কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাব, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাব না। বিস্মরণের বৃহৎ ভিতের উপর স্থাপিত মহাসিংহাসনেই কেবল যাঁদের ধরে, সর্বসাধারণের ঠাসাঠাসি ভিড়ে তাঁদের জন্যে জায়গা হবে না। এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোট-টুক্‌নেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চারিদিকেই মাচা বেঁধে বসে।

"ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্যোদয়কে তার নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মতো আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসত, ভয় আছে, একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে। সে অরসিক জানবেই না, সে-বাগান সেইখানেই যেখানে আছে, ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিস্ট সেই স্বর্গে যেতেও পারে, কিন্তু কোনো ক্যামেরাওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে—দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ময় খড়গ হাতে।"

জীবনীকারের লক্ষ্য কোনও পুষ বা নারীকে তাঁর সমকাল-সমেত জীবন্ত করে তোলা। এটা তখনই সম্ভব যদি তিনি রচনটি একজন ঔপন্যাসিকের নিষ্ঠা-সহকারে গড়ে তোলেন। একজন জীবনীকারের উচিত তাঁর বিষয়-সম্পর্কে সব কিছু জানা, কিন্তু যা কিছু জানেন সমস্তটুকুই উজাড় করে দেওয়া নয়। অনেক নথিপত্র বা তথ্য জীবনচরিতের মধ্যে বারংবার উপস্থাপিত হলে যে-কোনও জীবনী বিবর্ণ হতে বাধ্য। জীবনীকারকে তাই হতে হবে বর্জনে সাহসী ও গ্রহণে বিচক্ষণ। এই গ্রহণ-বর্জনের কাজটি জীবনী-রচনার ক্ষেত্রে দুরূহতম পর্ব। কোনও ব্যক্তির জীবনী-রচনার সময়ে দেখা যায় মূল বিষয়-সংক্রান্ত বহু চিঠিই সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু তাদেরই মধ্যে এমন কোনওটি থাকতে পারে যার একটিমাত্র বাক্যই প্রোজ্জ্বল করে তোলে একটি চরিত্রকে, দিনলিপির একটি নগণ্য ঘটনাই হয়তো উদ্ভাসিত করে তোলে কেন্দ্রীয় ব্যক্তির মনের কোনও গোপন কক্ষ, ঠিক যেভাবে শেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ রঙের আলতো ছোঁয়ায় চিত্রকর কোনও প্রতিকৃতিকে জীবন্ত ও বাঙময় করে তোলেন।

জীবনী লিখতে বসে রচয়িতাকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে ঘটনার কালক্রমের প্রতি। এমন অনেক জীবনী দেখা যায় যেখানে লেখা অমুক মহাপুষ জন্মেছিলেন তমুক গ্রামে। কিন্তু কথাটা হলো কোনও শিশুই মহাপুষ নয়। সব মানুষই ধাপে ধাপে আবিষ্কার করে জীবনের বহুস্তরীভূত বহুকৌণিক রূপ। একজন জীবনীকারকেও অনুরূপভাবে তা আবিষ্কার করতে হবে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটি হন স্ববিরোধী, যদি তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত হয় দ্রুত পরিবর্তনশীল ও নমনীয়, তবে তাঁর চরিত্রের সেই দিকটিও খেয়াল রাখতে হবে জীবনীকারকে।

অনেক জীবনীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে যেহেতু রচয়িতা কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটিকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়ে তুলতে চান, সাদা বা কালো রঙে ছুপিয়েই কাজ সারতে চান, একমাত্রিক রূপ ফুটিয়েই ক্ষান্ত হতে চান—যেন সেই মানুষটি শুধুই গুণের আধার নতুবা শুধুই দোষের। কিন্তু আমাদের আধুনিক মনের বিচারে কোনও মানুষই তা নন শতকরা একশোভাগ। গুণবান ব্যক্তিরও ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাঁরও ঘটে পদস্খলন। যে জীবনীকার এই ভ্রান্তিকে অস্বীকার করেন, তিনি আপন কাজ যথার্থরূপে পালন করেন না, বলা বাহুল্য। জর্জ সাঁ-র জীবনী 'লিলিয়া' প্রকাশের পর আঁদ্রে মরোয়াকে অনেকেই কিঞ্চিৎ অভিযোগের সুরে বলেন "আপনি জর্জ সাঁকে খুবই আকর্ষণীয়া করে তুলেছেন।" কিন্তু সত্যি-সত্যিই জর্জ সাঁ ছিলেন অতীব আকর্ষণীয়া। শুধু মুস্‌সে বা শোপ্যাঁ নন, ফ্লবেয়ার, বালজাক, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি—সকলেই ছিলেন তাঁর অনুরাগী। জর্জ সাঁ-র এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তোলেন মরোয়া।

আবার পাশাপাশি এটাও বলে রাখা দরকার যে একজন জীবনীকার কোনও ঔপন্যাসিকের মতোই, যদি অনেক কিছু প্রমাণ করতে চান, তবে শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুই প্রমাণ করতে পারেন না। এরকম 'সমস্যাসঙ্কুল' জীবনী অনেক রয়েছে, যেমন রয়েছে 'সমস্যাসঙ্কুল' নাটক। এগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হয়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে একটি মহান জীবন আমাদের মহৎ শিক্ষা দেয় না। আমি মনে করি এ হেন কোনও ব্যক্তির সার্থক জীবনী ছাড়া কোনও বই থেকেই এমন ফলবান শিক্ষা পাওয়া যায় না আর। কিন্তু সেই নীতিশিক্ষা যেন অন্তর্নিহিত থাকে জীবনীটিতে। নীতিকথামূলক একটি গ্রন্থ আর যাই হোক, শিল্প নয় কখনওই। মানুষের মনে কোনও শিল্পকীর্তির প্রভাব সব সময়ই নীতিকথার থেকে অধিকতর স্থায়ী ও প্রগাঢ়। একইভাবে একটি মহান জীবনীর প্রভাবও পরিব্যাপ্ত। তার কারণ এই নয় যে লেখক সেই রচনায় কতগুলো নীতিবাক্য আওড়ে যান। কিন্তু একটি মহান জীবন মূলত গভীর সৌন্দর্যেরই প্রকাশ।

জীবনী রচনার অন্যতম প্রধান শর্ত এই যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মতো পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রতি লেখককে হতে হবে সমপরিমাণে যত্নবান। কোনও পুষ বা নারীই জীবন-সংগ্রামে একক যোদ্ধা নয়। সব মহান ব্যক্তিই পরিবৃত হয়ে থাকেন বন্ধু ও শত্রু-দ্বারা। তাদেরও জীবন্ত করে তোলা চাই। এবং সময়ের তালে-তালে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এদের পরিবর্তন কিংবা বিবর্তনও চিত্রিত হওয়া উচিত।

মূল ও পার্শ্বচরিত্রদের ক্রমশ বার্ধক্যে উপনীত-হওয়া ও মৃত্যু—এই নিষ্করুণ অথচ অতি স্বাভাবিক তথ্যটিও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা আবশ্যক একজন জীবনীকারের পক্ষে। এর মাধ্যমে জীবন-সম্পর্কে রচয়িতার কোনও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় না। এটাই তো যথার্থরূপে বেদনা ও গ্লানিমোচনকারী, মনোরম ও মধুর পরিসমাপ্তি। সম্ভবত এই পর্যায়টি সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলে জীবনীকার তাঁর পাঠককে বলতে চান "ভয় পেয়ো না কিছুতেই। তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার শেষে অপেক্ষা করে আছে রহস্যময় ঋদ্ধি। নরকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও দুর্নিবার যাতনার মধ্যে দিয়ে গেছেন এবং অবশেষে একদিন লাভ করেছেন অখণ্ড শান্তি।"

২

কিন্তু জীবনী-বিষয়ে এত কথা বলার পর গোড়ার কথাটিতে বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হচ্ছে। বলেছি বটে জীবনী-সাহিত্য এক অনুপম শিল্পরূপ, কিন্তু সত্যিই কি তাই? না হলে রবীন্দ্রনাথ থেকে শু করে ভর্জিনিয়া উলফের মতো ব্যক্তিত্ব এ সম্পর্কে কেন অনাস্থা প্রকাশ করবেন? জীবনী-সাহিত্য সার্থক শিল্প কিনা, এই প্রশ্নটাই

হয়তো অবান্তর, এতকাল পর্যন্ত যত ভালো-ভালো জীবনী লেখা হয়েছে, সেই তালিকা স্মরণ করলে। কিন্তু একটা ক্ষীণ সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতেই থাকে যখন ভাবি সেইসব উৎকৃষ্ট জীবনীর তালিকা উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্যের তুলনায় এমন সংক্ষিপ্ত কেন।

এর একটি কারণ কি এই যে রস-সাহিত্যের তুলনায়—অর্থাৎ কাব্য ও কথা সাহিত্যের তুলনায়—জীবনী-সাহিত্য নবীন কলা? আমরা আপন হৃদয়ের কথা যখন থেকে শুনতে ব্যাকুল, অপরের জীবনকথা জানার আগ্রহ সে-তুলনায় অনেক পরে জন্মেছে। আধুনিক অর্থে জীবনী-সাহিত্যের চল পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেককাল যাবৎ, আর ঢল নামে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা ভাষার জীবনী-সাহিত্যের বিকাশ দেখা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।২

উভয় ক্ষেত্রেই দেখি যে ততদিনে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলি পরিণত ও ফলশালী। কিন্তু নবীনতা-প্রবীণতার প্রশ্নটি বাদ দিলেও, জীবনী-সাহিত্যের উপর রস-সাহিত্যের জিত এখানেই যে একজন রস-সাহিত্যিক সর্বদা মুক্ত ও স্বাধীন, একজন জীবনীকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রতিকৃতি-অঙ্কনের ক্ষেত্রে মহান চিত্রকরেরা বাহ্যিক অবয়বের সাদৃশ্য বজায়-রাখা ছাড়াও হৃদয়ের রূপ ফুটিয়ে তোলার দিকেও খেয়াল রাখেন। কিন্তু একজন জীবনীকারের 'সমস্যা' এই যে তাঁকে অনন্যোপায় হয়েই তথ্যনিষ্ঠ থাকতে হয়। তাঁর হাতে পুঁজি যতটুকু, তার বাইরে যাবার জো নেই। আর সেই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি জীবনীগুলি যে পরিমাণ তথ্যসমৃদ্ধ সে-পরিমাণ রসসমৃদ্ধ নয়। গল্প-কবিতা-উপন্যাস লেখার বেলায় লেখক যত খুশি "আপন মনের মাধুরী", "অধিকতর বাস্তব"-এর আমদানি করতে পারেন, কিন্তু জীবনীকার সে পথে পা বাড়ালে ভরাডুবি নিশ্চিত। অতি সাবধানী হবার ফলে জীবনীকারেরা প্রায়শই এমন অনেক জীবনী লিখে থাকেন যেখানে বর্ণিত চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত মূল ব্যক্তিটির ছাঁচে ফেলা নিষ্প্রাণ প্রতিরূপ হয়েই থমকে থাকে কেবল চোখ নাক-ভুরু-কপালের ভাঁজ অবিকল এক, ঠিক যেমনটি মাদাম তুসোর সংগ্রহশালার মোমের পুতুল।

কিন্তু আহৃত তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও কোনও জীবনচরিতকে যে উত্তীর্ণ করা যায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে, তা প্রমাণ করেন লিটন স্ট্র্যাচি এবং জীবনী-সাহিত্যের সেই স্বাধীনতারই পরীক্ষা তিনি নেন রানি ভিক্টোরিয়ার জীবনীর বেলায়। এই দুরূহ কাজের ঝুঁকি নেন তিনি, এবং প্রমাণ করেন আপন প্রতিভা, প্রমাণ করেন যে জীবনী-সাহিত্যের হৃদয়ের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু ভিক্টোরিয়ার জীবনের সব কিছুই ছিল জ্ঞাত। তিনি যা করেছেন, যা ভেবেছেন, সবই ছিল সকলের পরিচিত। জীবনীকারকে তাই কোনও কিছু আবিষ্কার করতে হয়নি। যা কিছু তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা মিলিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল হাতের কাছে প্রমাণাদি থাকার ফলে। তথ্যের গ্রহণ-বর্জন, নির্বাচন-বিশ্লেষণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করেন স্ট্র্যাচি, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তথ্যের বাইরে যাননি। আর তাই শেষ পর্যন্ত রানি ভিক্টোরিয়ার জীবনীটি বসওয়েল-কৃত জনসনের জীবনীরই সমগোত্রীয় হতে পেরেছে রূপে-গুণে। কিন্তু সেখানে যতই বাস্তব, সুসংবদ্ধ, স্পষ্টত প্রতীয়মান হোন না কেন সম্রাজ্ঞী, তাঁর জীবনীটি কি এতদ্‌সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ নয়? এমন কি হতে পারে না যে একটি জীবনী তথ্যনিষ্ঠ থেকেও হয়ে উঠবে কবিতার মতো নিবিড়, নাটকের মতো উত্তেজক ও চমকপ্রদ, উপন্যাসের মতো পরিব্যাপ্ত? আবার এই লিটন স্ট্র্যাচিই যখন লিখতে বসেন 'এলিজাবেথ অ্যান্ড এসেক্স', তখন রানি এলিজাবেথ ও এসেক্সের জীবন ও জগতের স্বল্প পরিচিতির ফলে, তাঁর সামনে সুযোগ ছিল শিল্পীর মতো আবিষ্কার, করার, যে আবিষ্কার তিনি তথ্য দিয়ে সমর্থন করতে পারবেন, অর্থাৎ এমন একটি গ্রন্থ-রচনা—যেটি শুধুই জীবনী নয়, কিন্তু শিল্পকীর্তিও বটে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হন স্ট্র্যাচি। তাঁর এলিজাবেথ কখনওই বাস্তব হয় না ভিক্টোরিয়ার মতো, আবার শেক্সপিয়র-সৃষ্ট ক্লিওপেট্রার মতোও কাল্পনিক নয় সে। এলিজাবেথের জীবনী লেখার বেলায় স্ট্র্যাচি প্ররোচিত হন শিল্পীর মতো আবিষ্কার করতে, কিন্তু যেহেতু এতটুকু হলেও এলিজাবেথের জীবন আমাদের জ্ঞাত, তাই সেই আবিষ্কারের উপায়, সেই শিল্পীর স্বাধীনতার সুযোগ আঠেরোআনা ছিলো না তাঁর। 'কুইন ভিক্টোরিয়া'-র সাফল্য এই জন্যই যে স্ট্র্যাচি সে ক্ষেত্রে জীবনী-রচনাকে দেখেন কারিগরি শিল্পরূপে, 'এলিজাবেথ অ্যান্ডএসেক্স'-এর বেলায় তিনি জীবনী-রচনায় ব্রতী হন সৃজনশীল শিল্পের প্রেরণায়।

জীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা অনেক সময়ই জটিল আকার নেয়। সমস্যাটি নৈতিক প্রশ্ন ঘিরে। আলোচিত ব্যক্তির জীবনচরিতটিতে কতদূর পর্যন্ত বর্ণিত হবে তাঁর চরিত্র? সেখানে কি শুধুই উপস্থাপিত হবে তাঁর নিষ্কলুষ গুণাবলী, নাকি যথাযথরূপে চিত্রিত হবে তাঁর দোষ-গুণ, সাফল্য-ব্যর্থতা, শুভ্রতা-কলঙ্ক, তুচ্ছতা-মহত্ত্ব? গোর্কি-রচিত 'রেমিনিসেন্সেস অভ টলস্টয়' ভালো লাগেনি রবীন্দ্রনাথের। তাঁর কথায়

"ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ-লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ, টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না, এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি-যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তার ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখে ছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হত। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, এ কথা মানতে পরি নে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক বিচারে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর তবেই যা না-ভোলবার তা বড় হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।"

'যাত্রী'

অনেকটা একই কারণে টেনিসনের জীবনীও রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সুরেই 'কবিজীবনী' (আষাঢ় ১৩০৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন

"কবি টেনিসনের পুত্র তাঁহার পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ দুই খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

"... অনেক ভ্রমণকারী বড়ো বড়ো নদীর উৎস খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড়ো কাব্যনদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হয়। আধুনিক কবির জীবনচরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে এমন আশা মনে জন্মে। মনে হয় আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই; কাব্যস্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে, সে পর্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।

"সেই আশা করিয়াই পরমাগ্রহে বৃহৎ দুই খণ্ড বই শেষ করা গেল। কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভার আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।

"কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে; যাঁহারা কর্মবীর তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন ভাষার মধ্য হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলেন, যেমন সামান্য ভাবকে অসামান্য সুর এবং ছোট কথাকে বড় অর্থ দিয়া থাকেন, তেমনি কর্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্মাণ করেন এবং চারি দিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব ক্ষমতাবলে বড়ো করিয়া লন। তাঁহারা হাতের কাছে যে-কিছু সামান্য মালমসলা পান তাহা দিয়াই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবন মানুষ ফেলিতে পারে না।

"কিন্তু কবির জীবন মানুষের কী কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কী আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবনচরিত মহাপুষের এবং কাব্য মহাকবির।

"টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে। তাহা সৎ লোকের জীবন বটে, কিন্তু তাহা কোনো অংশেই প্রশস্ত, বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে। তাহা তাঁহার কাব্যের সহিত সমান ওজন রাখিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহার কাব্যে যে অংশে সংকীর্ণতা আছে, বিশ্বব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতি সভ্যতার দোকান-কারখানার সদ্য-গন্ধ কিছু অতিমাত্রায় আছে, জীবনীর মধ্যে সেই অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়; কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তাকে একটি উদার সংগীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

"আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সে জন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য।"

'সাহিত্য' (১৯০৭)

টলস্টয় বা টেনিসনের জীবনীই শুধু নয়, নিজের জীবনীও ভালো লাগেনি রবীন্দ্রনাথের। প্রবোধকুমার সান্যাল-রচিত 'বনস্পতির বৈঠক' (সাহিত্যসংস্থা, ১৯৯০) গ্রন্থে এ-বিষয়ে চমকপ্রদ ইঙ্গিত পাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্রবোধকুমার বলেন

"কবির সঙ্গে এই আমার প্রথম মুখোমুখি, মাত্র হাত তিনেকের ব্যবধান। সে জন্য আমার প্রচুর আড়ষ্টতা, হৃৎকম্পন, বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়, কথায়-কথায় থতিয়ে যাওয়া—এগুলির আশঙ্কা ছিল মনে।

"কবি একসময় বললেন, তুমি হাঁটতে জানো। হাঁটতে হাঁটতেই তুমি জীবনকে দেখতে পাও। তোমার মন চলমান। বদ্ধ জলায় তুমি বাঁধা থাকতে চাও না।

"তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি যেন আমার মনে রোমাঞ্চ শিহরণের মতো। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আমার একটু সাহস বেড়েছিল। মুখ ফুটে একসময় বললুম, আপনার নিজের বিরাট জীবন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু আপনার হাত দিয়ে আপনার মন দিয়ে সেই পৃথিবীকে আমরা ত দেখিনি! তবে কি 'জীবনস্মৃতি' বইটি নিয়েই আমরা চুপ করে যাব?

"কবি তাঁর শ্বেতশ্মশ্রুতে একবার হাত বুলোলেন। তাঁর দুই কপোলে কি আমি চকিতহাসির আভা দেখলুম? না, এখন আর আমার মনে নেই। উনি বললেন, ও বইখানা বিশেষ কালের বিশেষ কয়েক ব্যক্তির ছবি। তুমি ঠিক ধরেছো। ওটা আমার আত্মজীবনী নয়।

"কবিসন্দর্শনে আসবার আগে স্থির করে এসেছিলুম, এই বিশাল বিশ্বজোড়া ব্যক্তিত্বকে পনেরো মিনিটের বেশি আটকিয়ে রাখব না। তবু ওরই মধ্যে একবারটি বললুম, তবে কি 'রবীন্দ্রজীবনীই' আপনার জীবন? ওর বাইরে কিছু কি নেই?

"এই প্রশ্নটিতে কবি যে এমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন, এটি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'পড়ো না, ও বই তুমি পড়ো না। ওতে জীবন নেই। আছে বিবরণ। আমি প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, আর এখানে-ওখানে কিছু হাততালি পাবার খবর,—এই কি আমার পরিচয়? ... না, ও বই পড়ো না!'

" 'যদি আর অন্তত পঞ্চাশ বছর বাঁচি'—কবি বলে যাচ্ছিলেন—'তা হলে নিজের হাতে নিজের জীবনী লিখে রেখে যাব! তুমি ছাড়া তোমার জীবনকথা অন্যে কেমন করে জানবে? জীবনের কোন্ অংশ তোমার বিচারে শ্রেষ্ঠ, কত দুর্লভ মুহূর্তের ভাবাবেগ, কত ঘটনার ব্যঞ্জনা তোমার হৃদয়ে দ্বন্দ্বের দোলা আনে, তোমার সত্তার

মূল ধরে টানে কত উপলব্ধি—তুমি ছাড়া এ সংবাদ অন্য কে জানবে?' " ৩

জীবনী-সাহিত্য যে উঁচু দরের আর্ট নয়, এ কথা রবীন্দ্রনাথের মতো ভর্জিনিয়া উল্‌ফও মেনে নেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে ভালো জীবনী রচনার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো কেন্দ্রীয় ব্যক্তির চরিত্রের ইতিবাচক ও উজ্জ্বল দিকের সঙ্গে তাঁর নেতিবাচক ও অনুজ্জ্বল দিকের উল্লেখ থাকবে সেখানে; জীবনীকারকে সে কথা বলার স্বাধীনতা দিতে হবে "so far at least as the law of libel and human sentiment allow."

অবশ্য পাশাপাশি উল্‌ফ এ কথাও স্বীকার করেন যে কারও ব্যক্তিগত জীবনের facts' বিজ্ঞানের 'facts' তুল্য নয়। বিজ্ঞানের 'facts' আবিষ্কৃত হওয়ামাত্রই, অপরিবর্তিত। জীবনের 'facts' মানুষের মতামতের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। আজ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারও জীবনের কোনও ঘটনা-প্রসঙ্গে যে মতামত দিচ্ছে সমাজ, কাল সেই মতামত নাও দিতে পারে, কারণ কালকের সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে সেই মতামতের পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আজ কারও জীবনের কোনও ঘটনা যদি পাপ বলে ঠাওরানো হয়, কাল তা অনুসন্ধানের ফলে মনে হতেই পারে যে সেটা ছিল সেই মানুষটির নিছক দুর্ভাগ্য কিংবা কোনও তুচ্ছ ভ্রান্তি—এর বেশি কিছু নয়। কিংবা দুর্ভাগ্য বা ভ্রান্তি—কোনওটাই নয়, সেটা দেখা হতে পারে এক অকিঞ্চিৎকর ও বিস্মরণযোগ্য ঘটনা-রূপে। আর এইভাবে আলোচ্য ব্যক্তিটির জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখা অনেক শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরে যায়, সেই জঞ্জাল সময়ের স্রোতে মুছে গিয়ে মানুষটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় ক্রমশ। তখন জীবনীর ক্ষেত্রে 'বাল্যকাল', 'ছাত্রজীবন' 'কর্মজীবন', 'বিবাহ' ইত্যাদি শিরোনামে ভূষিত স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদগুলি বাহুল্য ঠেকে। নবীন আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রকৃত অস্তিত্ব।

একজন জীবনীকারকে তাই এগোতে হয় সকলের আগে, খনি গহ্বরে প্রবেশকারী মশালচির মতো। তাঁকে পরীক্ষা করতে হয় প্রকৃতি ও পরিবেশ, বিচার করতে হয় সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব, সচেতন থাকতে হয় চলিত রীতির সারবত্তা-সম্পর্কে। তাঁর সত্যের বোধ থাকবে সদাজাগ্রত, সদাসচেতন। এই তথ্যপ্লাবনের যুগে, যখন প্রতি মুহূর্তে অগুনতি নতুন-নতুন পরস্পর-বিরোধী কথা জন্ম নেয় কোনও বিশেষ ব্যক্তি-বিষয়ে, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমের দৌলতে যখন খুব কম জিনিসই গোপন থাকে, তখন জীবনীকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে আলোচ্য মানুষটির বিচিত্র রূপের প্রকাশ দেখার জন্য। এর কোনওটিই যেন তাঁকে বিমূঢ় ও হতচকিত না করে। এই সব বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে বিভ্রান্তি জন্ম নেবার পরিবর্তে জন্ম নেবে নিবিড় সংহতি, সমৃদ্ধ অন্তর্ভুবন। এখান থেকেই আর একটি প্রশ্ন জন্মলাভ করে। আজ যেহেতু এক কালের অনেক অজ্ঞাতই জ্ঞাত, তবে কি শুধুই মহাপুষদের জীবনী রচিত হবে? নাকি যে-কোনও কৃতী ব্যক্তিরই—যিনি ঘটনাবহুল এক জীবন অতিবাহিত করেছেন যুগপৎ সাফল্য ও ব্যর্থতা সমেত, এবং সেই জীবনযাপনের চিহ্ন রেখে গেছেন সমাজ-সংস্কৃতিতে—জীবনী রচিত হওয়া উচিত? নাকি কৃতী ব্যক্তি না হলেও হবে, অতি সাধারণ এক মানুষ, স্বহস্তে দিনলিপি লিখে গেলেই শুধু সেটি অবলম্বন করে তার জীবনী লেখা কাম্য? আর কাকেই বা বলব মহান ব্যক্তি, কাকেই বা বলব নগণ্য? সাধারণ-অসাধারণের ভেদরেখা কোথা থেকেই বা টানা হবে? এমনটি হতে পারে নাকি যে একজন সাধারণ মানুষের জীবনী লেখা হলে তার থেকে আমরা খুঁজে পেতে পারি কোনও নতুন নায়ক? এ-প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হয় রবীন্দ্রনাথে। 'চারিত্র-পূজা'-য় (চৈত্র ১৩০৮) তাঁর বক্তব্য

"য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিত-বায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনো মতে, একটা যে-কোনো প্রকারের বড়োলোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে লিখিত জীবনচরিতের জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু একটা পারে তাহারই জীবনচরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন। টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।"

এর বেশ কিছুকাল পর 'ঋষিসাহিত্য' (মাঘ ১৩১৩) প্রবন্ধে এ-কথাটিই আরও বিশদভাবে বলেন

"বস্তুত ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞান দর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেল ফল যে কারণে মাটিতে পড়ে সূর্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে, এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুশি হইবার কোনো কারণ ছিল না। টানে তো টানে, আমার তাহাতে কী? আমার তাহাতে এই, জগৎ-চরাচরের এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম, সর্বত্রই আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধূলি হইতে সূর্যচন্দ্রতারা সবটা মিলিল। এমনি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া মানুষের কাছে তাহাকে বেশি করিয়া প্রকাশ করিতেছে, নিখিলচরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া অবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে। সমস্তের সঙ্গে এই বুদ্ধির মিলনই জ্ঞান। এই মিলনেই আমাদের বোধশক্তির আনন্দ।

"তেমনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্মকে পূর্ণচেতনরূপে পাইবার জন্যই অন্তরে বাহিরে কেবলই বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এই জন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া যেখানে মানবের ধর্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণ সুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে সেখানে বড়ো আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড়ো করিয়া পাই।

"মহাপুষের জীবনী এই জন্যই আমরা পড়িতে চাই। তাঁহাদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিই মুক্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণ ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক—সেই ঐক্য যতটা মাত্রায় আমি ঠিকমত অনুভব করিব ততটা মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ।

"কিন্তু জীবনীতে ও ইতিহাসে আমার সমস্তটা আগাগোড়া স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাহাও অনেক বাধায় অনেক সংশয়ে ঢাকা পড়িয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাহার মধ্য দিয়াও আমরা মানুষের যে পরিচয় পাই তাহা খুব বড়ো, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পরিচয়কে আবার আমাদের মনের মতো করিয়া, তাহাকে আমাদের সাধ মিটাইয়া সাজাইয়া, চিরকালের মতো ভাষায় ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাদের অন্তরের একটা চেষ্টা আছে। তেমনি করিয়া পারিলে তবেই সে যেন বিশেষ করিয়া আমাদের হইল। তাহার মধ্যে সুন্দর ভাষায় সুরচিত নৈপুণ্যে আমার প্রীতিকে প্রকাশ করিতেই সে মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সে আর এই সংসারের আনাগোনার স্রোতে ভাসিয়া গেল না।"

৩

ইতিহাসের যে-পর্বে ইংরেজি-ভাষী দুনিয়াকে শাসন করছেন ক্যালভিন কুলিজ ও পঞ্চম জর্জ, যখন এচ. এল. মেনকেন ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলছেন মূঢ় জনসমাজকে, যখন লিটন স্ট্র্যাচি ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন একের পর এক পবিত্র সৌধ, আর বিলিতি বুক ক্লাবগুলি প্রতি মাসেই আবিষ্কার করছে এক-একটি নতুন 'র‍্যাডিকাল মাস্টারপিস', সেই সময় জীবনী-সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে যায়। জীবনী-সাহিত্যের অরণ্যানীতে যেন নবীন বসন্তের দোলা লাগে। 'এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস' পড়ে যাঁরা প্রায় পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়েন, যাঁরা ফ্রয়েড পড়ে (কিংবা না-পড়ে) আপ্লুত হন, শ্য-এর শাণিত বিদ্রূপের কড়া মদ যাঁদের আচ্ছন্ন করে রাখে আর হেনরি অ্যাডামসের সুতীক্ষ্ন পরিহাস যাঁদের কানে কুহুরবের মতো ধ্বনিত হয়, যে সব মনস্তাত্ত্বিকের দল পরের চশমা নাকে লট্‌কে মুহূর্তের মধ্যে বুঝে যান কোনও গুত্বপূর্ণ যুদ্ধের আগের রাতে ক্রমওয়েলের মনে ঠিক কীরকম চিন্তার উদয় হয়েছিল আর এমার্সন ও থরোর কোনও প্রামাণ্য বিবরণীবিহীন কথোপকথনের মধ্যে বলা হয়েছিল ঠিক কোন-কোন বাক্য—তাঁরাই সূচিত করেন নব্য জীবনী-সাহিত্য। ইতিহাসের এই বিশেষ সময়কে আমরা যদি অভিহিত করি 'পুনর্মূল্যায়নের কাল'-রূপে, তবে একই সঙ্গে এ-ও বলতে হয় যে এই 'এজ অভ রিভ্যালুয়েশন' ঠিক ততটাই প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত করে প্রাচিন ঐতিহাসিক মানদণ্ডকে যেমনটি হতে দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যখন যাবতীয় পুরনো হিসেবপত্র পাল্‌টে যায় রাতারাতি। বিংশ শতাব্দীর দুইয়ের দশকের প্রায় আগাগোড়াই শোনা যায় বেদি থেকে মূর্তি অপসারণ ও নিক্ষেপের শব্দ। ডব্লু. ই. উডওঅর্ড-দ্বারা জর্জ ওঅশিংটন পুনর্মূল্যায়িত হন এমন এক ব্যক্তিরূপে যিনি বিবাহ করেছিলেন অর্থের লোভে, নির্মমভাবে প্রহার করতেন দলের সৈনিকদের, গুত্বপূর্ণ পদে আসীন সহকর্মীদের প্রতি ছিলেন ঈর্ষাকাতর ও কলহপ্রবণ, এবং সদ্য-ভূমিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রের সরকারি ক্ষেত্রে যে-সব জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো সেগুলি সমাধানের বেলায় সবসময়ই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। এব্রাহাম লিঙ্কন শস্তা ধাপ্পাবাজ রাজনীতিক-রূপে চিত্রিত হন এডগার লী মাস্টার্স-দ্বারা। এই মূর্তি-ভাঙার আনন্দে, সংশোধনবাদের জোয়ারে অনাবশ্যক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয় অনেক। এখানেই শেষ নয়। জীবনী-সাহিত্যের খাসমহলে রীতিমতো হাত-ধরাধরি করে প্রবেশ করে কল্পিত চেতন ও অবচেতন। জীবনী লিখতে বসে অনেকে কষ্টকল্পিতভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। প্রাচিনপন্থী জীবনী-রচয়িতারা যেখানে অনেক সময়ে বলতেন "আমরা জানি না", নবীন জীবনীকারদের অনেককেই সেখানে বুক চাপড়ে ঘোষণা করতে দেখি "আমরা সবই জানি"। মেরি, কুইন অভ স্কটস-এর আবেগ, দুর্বলতা, ট্র্যাজেডি এবং তার মানসিক অবস্থা লাগামছাড়া কল্পনার সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তোলেন স্তেফান ৎসোয়াইগ। এমনকি এমিল লুডভিগের মতো ক্ষমতাশালী জীবনীকারও বিসমার্কের জীবনী লিখতে বসে এই কঠিন কঠোর, সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিত্বকে (যাঁকে 'শক্তিমত্তার রাজনীতি'-র অন্যতম পথিকৃত বলা যায়) পর্যবসিত করেন উল্লম্ফনকারী রোমান্টিক চরিত্রে। আর লুডভিগ যখন ক্লিওপাট্রার জীবনী লেখেন, সেটাও হয়ে ওঠে 'biographie -র সুস্বাদু দৃষ্টান্ত। ফ্রয়েডসাহেব ও তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে জীবনীকারদের যে আরও অনেক কিছু শেখা বাকি আছে, তা প্রকাশ হতে থাকে ক্রমশ, এবং সেইসঙ্গে এও প্রমাণিত হয় যে শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনঃসমীক্ষণই জীবনী রচনার একমাত্র উপায় নয়, চরিতসাহিত্যিককে প্রস্তুত হতে হবে প্রভূত সমর্থনযোগ্য তথ্য এবং সুসংহত বৈজ্ঞানিক প্রণালী-দ্বারা। নবীন চরিত সাহিত্যিকদের আতিশয্যের ফলে জীবনী-সাহিত্য অচিরেই রূপান্তরিত হয় বাজারি বস্তুতে। যে-কোনও জনপ্রিয় পণ্যের মতো জীবনী-সাহিত্য বিকোতে থাকে সুপ্রচুর, কিন্তু জনপ্রিয় পণ্যের মতোই জীবনী-সাহিত্যও ক্রমশ হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর, চিহীন ও মিথ্যাশ্রয়ী।

হয়তো এই কারণেই জীবনী-সাহিত্যের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার-ভূষিত অ্যালান নেভিলস বলতে বাধ্য হন

''The most reprehensible aspect of the re-evaluations and the pseudo-psychoanalysis, beyond doubt, was their shifting of the lens from the vital to the trivial—their distortion of the image. What was truly important in William Shakespeare was not the possible neurosis behind the bequest of his second-best bed to his wife, but his authorship of 'Hamlet'. What was truly memorable in George Washington was not his well–restrained interest in Mrs. Sally Fairfax, but his establishment of the American Republic.''

ন্যু ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট, ন্যু ইয়র্ক সান, ন্যু ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড-এর সম্পাদকীয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনী-সাহিত্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির কী আশ্চর্য সাদৃশ্য!

একজন জীবনী-সাহিত্যিকের পরিমিতিবোধ নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত চিবোধের উপর। অবশ্য প্রাচীনপন্থী ভিক্টোরিয়ান জীবনীগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিল, ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ আক্রান্ত হবার ফলে প্রায়ই দাঁতে দাঁত চেপে থাকত, তা নিঃসন্দেহে জীবনী-সাহিত্য পাঠকের কাছে বিরক্তিকর, কিন্তু বিশ শতকের শুতে যে ধরনের মুচমুচে, মুখরোচক জীবনী-সাহিত্য দেখা গেল, তা ভিক্টোরিয়ান জীবনী-সাহিত্য ধারার তুলনায় আরও বিরক্তিকর। বেন্‌জামিন ফ্র্যাংকলিন যেমন তাঁর আত্মজীবনীতে নগণ্য যত ভ্রান্তি অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করে আপন জীবনের চলার পথে অনায়াসে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, হালের জীবনীকারেরা ঠিক তেমনভাবে না হলেও অকিঞ্চিৎকর ধূলিকণাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রমিয় করে তুলতে সদা সচেষ্ট।

জীবনী-সাহিত্যের এই হবু-বিপ্লবীদের যাবতীয় ব্যর্থতা লুকিয়ে আছে পরিমিতি-বোধ ও চিবোধের অভাবে। ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রথম সারির জীবনীকারেরা কিন্তু প্রমাণ করে গেছেন যে চি ও পরিমিতিবোধ স্পষ্টভাবে, অনাড়ম্বভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। 'ফাদার অ্যান্ড সন'-এ এডমন্ড গ্যস যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর পিতার চিত্র, এমন অকপট ভঙ্গিমা হাল আমলের ক'জন জীবনীকারের মধ্যে আছে? আর সেই অকপট ভঙ্গিমাও কী আশ্চর্যচিসম্মত! 'লাইফ অভ টমাস কার্লাইল'-এর

ক্ষেত্রে ফ্রুড এবং 'লাইফ অভ শার্লট ব্রন্টি'র ক্ষেত্রে শ্রীমতী গাস্কেল যথাক্রমে কার্লাইল ও শার্লট ব্রন্টির দোষগুলি এবং তাঁদের জীবনের নিন্দনীয় দিক-সম্পর্কে এতটাই অকুণ্ঠ ছিলেন যে কার্লাইল ও শার্লট ব্রন্টির আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গ বিক্ষুব্ধ হন। কিন্তু ফ্রুড ও শ্রীমতী গাস্কেল—এতদ্‌সত্ত্বেও মানতে হবে—এই অতুলনীয় জীবনী-দুটি লেখার সময়ে চি খোওয়াননি এক মুহূর্তের জন্য; কার্লাইল ও ব্রন্টি-বোনেদের প্রতিভা বিস্মৃত হননি এতটুকু।

স্ট্র্যাচির 'এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস' যাবতীয় বেপরোয়া অতিকথন-সত্ত্বেও, এমন এক সংস্কারসাধনের আন্দোলন সূচিত করে যার দ্বারা জীবনী-সাহিত্য লাভবান হয় আখেরে। বদ্ধ, গুমোট ঘরের জানলা খুলে টাটকা বাতাস বইতে দেয় এই গ্রন্থটি। ভিক্টোরিয়ান জীবনী-সাহিত্যের যা কিছু নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য তথ্য ও বর্ণনার আধিক্য, কেন্দ্রীয় চরিত্রের নেতিবাচক দিক এড়িয়ে যাবার অসৎ প্রয়াস ও নৈতিক উপদেশের আড়ম্বর—এ সবের অসারতা স্পষ্ট করে তোলে। জীবনী-সাহিত্য মানেই প্রশংসাসর্বস্ব মনোভাব, এই ধারণাটি ম্লান হয়ে আসে। মর্লি-রচিত তিন খণ্ডে 'গ্ল্যাডস্টোন' নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় কীর্তি, ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় উজ্জ্বল; কিন্তু এই সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বলতা হয়তো এই জন্যই যে গ্রন্থটি সমালোচনাহীন স্তুতিবাক্য ও নীতিকথায় বোঝাই। আর তাই শেষ পর্যন্ত এটি এক জগদ্দল মূর্তির মতো দুর্বহ ও কষ্টকল্পিত ঠেকে। জীবনী লেখার বেলায় জীবনীকারকে যে হতে হবে নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিক, এ কথা আমরা প্রথম জানতে পারি 'এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস' পড়েই। মানছি টমাস আর্নল্ড গর্ডন ও ফ্লরেন্স নাইটিংগেলের ছবি আঁকার সময়ে স্ট্র্যাচি হয়ে উঠেছিলেন অতিমাত্রায় 'নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিক', এর ফলে অনেকাংশে এই মানুষদের প্রতি সুবিচার করেননি এবং উত্তরকালের কাছে সমালোচিত ও হন প্রবলভাবে। কিন্তু এই বিশেষ গুণটির প্রয়োজনীয়তা পরবর্তীকালের চরিত-সাহিত্যিকরা উপলব্ধি করেন স্ট্র্যাচির আদর্শ সামনে রেখেই। এই কথার সূত্র ধরে বলা যায়, প্রাচীনপন্থী জীবনী সাহিত্যের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য পরিহারযোগ্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার অধিকাংশ সদ্‌গুণ, মহান চরিত-সাহিত্যিকদের দৃষ্টান্তগুলি আজ প্রবলভাবে স্বীকৃত ও অনুসৃত। এখনও পর্যন্ত ভিক্টোরিয়ান ও ভিক্টোরিয়ান-পূর্ব চরিত-সাহিত্যধারার রীতিনীতিগুলিই স্পষ্ট। হাল আমলের যোগ্যতম জীবনীকারও অস্বীকার করতে পারবেন না আঠেরো ও উনিশ শতকের জীবনী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগুণাবলী। সে-সব গ্রন্থের বিষয়-প্রাচুর্য, ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা, ভাষার গভীরতা ও টুকরো টুকরো ঘটনা-উপঘটনা পরিবেশনের মাধ্যমে চরিত্রচিত্রণের প্রয়াস, সামাজিক-রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটের সানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি পরিমিত ও যথাযথ মনোনিবেশ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি অভ্রান্ত গুত্ব-প্রদান—সবই আজকের জীবনীকারের পক্ষে অনুধাবন ও অনসরণযোগ্য। আঁদ্রে মরোয়ার 'এরিয়েল' (শেলির জীবনী), ল্যুইস মামফোর্ডের 'হের্মান মেলভিল' ও ভ্যাঁসা ক্রন্যাঁর 'নেপোলিয়ন'-এর নির্মেদ ও শাণিত উপস্থাপনার পাশাপাশি বসওয়েল, লকহার্ট, ফ্রুড-দের গুভার ও প্রগাঢ় রচনাগুলি আজও সমানভাবে বরণীয়। কিশলয় ঠাকুরের 'পথের কবি'র তুলনায় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' কম আধুনিক নয়।

বিশ শতকের তিনের দশকে এমন হাওয়া উঠেছিল যে একাধিক খণ্ডের জীবনী সাহিত্যের দিন ফুরিয়েছে। কিন্তু সে-ধারণা যে কত ভুল তা অচিরেই প্রমাণ হয়। চার্চিলের 'লাইফ অফ মার্লবরো' (চার খণ্ড) এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী' (চার খণ্ড)-র একটি পরিচ্ছেদেও কি অনাবশ্যক?

বস্তুত যে কোনও পূর্ণাঙ্গ জীবনীই যেন সাতমহলা প্রাসাদ, যার মধ্যে জীবনীকার তাঁর কেন্দ্রীয় ও পার্শ্বচরিত্রদের নিয়ে হেসে খেলে বেড়াতে পারেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উৎকৃষ্ট জীবনী-সাহিত্যগুলি উত্তরকালের চরিত-সাহিত্যিকদের জন্য সঞ্চিত রেখেছে বহুবিধ আদর্শ। জীবনী-সাহিত্যের থাকতে পারে একাধিক লক্ষ্য, সে হতে পারে নানা ধরনের, অর্জন করতে পারে হরেক বৈশিষ্ট্য। যিনি প্রকৃত অর্থে মহান জীবনীকার, তিনিই গড়ে তুলতে পারেন নিজস্ব নিয়ম, নির্ধারণ করতে পারেন রচনার দৈর্ঘ্য, নির্বাচন করতে পারেন উপযুক্ত পথ যে পথ ধরে এগোলে তিনি আলোচ্য ব্যক্তি ও সময়ের স্বরূপ পরিস্ফুট করতে পারবেন।

একটি জীবনীর ক্ষেত্রে আমরা তখনই 'মহান' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে পারি যখন সে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রথমত, কেন্দ্রীয় চরিত্রটি এমনভাবে পুনর্সৃষ্টি ঘটাতে হবে যাতে পাঠকের কাছে তা জীবন্ত বোধ হয়। বসওয়েলের জনসন কি এক অর্থে ডিকেন্সের মি. মিক্যবর কিংবা বালজাকের পিয়ের গরিও-র মতোই সপ্রাণ নয়? দ্বিতীয়ত, একটি ধ্রুপদী জীবনীর আগাগোড়া হতে হবে সুপাঠ্য; গল্প-উপন্যাসের শক্তি-শালী কাহিনীভাগ যেমন রচনাটিকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে ছাড়ে, একটি জীবনীরও অনুরূপভাবে পাঠককে বিমোহিত রাখা উচিত। এবং তৃতীয়ত, সেই জীবনীটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহ শুধু গুত্বপূর্ণ হলেই চলবে না, তাদের হতে হবে বৈশ্বিক মানবজীবনের সঙ্গে সুতীব্ররূপে সংযুক্ত।

কত বিরল যথার্থ মহান জীবনী, ক'টি চরিত-সাহিত্যই বা উপযুক্ত শর্তগুলি পূরণ করতে পারে! সমগ্র বিংশ শতাব্দীই তো ইতিহাসের এক বিপুল বিক্ষুব্ধ পর্ব, নাটকীয়তা-পূর্ণ। কত বড় বড় দেশনেতা, সমরনায়ক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এসেছেন গেছেন। কিন্তু এঁদের ক'জনকে নিয়েই বা রচিত হয়েছে একটি সার্থক জীবনী, যে জীবনী পড়ে আমরা উজ্জীবিত হতে পারব?

তাই মাঝে-মাঝে মনে হয় আজ আমাদের মধ্যে যখন এসে গেছেন এমিল লুডভিগ, আঁদ্রে মরোয়া আর প্যাট্রিক ও' ব্রায়ান; প্রশান্তকুমার পাল, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও গোলাম মুরশিদ, তবু জীবনী-সাহিত্য এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি। এখনও তার সামনে পড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, সমস্যা ও বিপদসঙ্কুল, কর্ষিত হবার জন্য উন্মুখ। এ কথা ঠিক যে রস-সাহিত্যের বিকল্প কখনোই নয় জীবনী-সাহিত্য। কিন্তু সে আমাদের স্বতন্ত্র রসের সন্ধান দিতেই পারে। অনেক সময়ই সে রস হতে পারে সৃজনশীল সাহিত্যরসের মতো চিরস্থায়ী ও তৃপ্তিদায়ক। সৃজনশীল শিল্পীর মতো পাঠকহৃদয়ে একজন জীবনীকার হয়তো সাধারণত হন না দীর্ঘজীবী ও খ্যাতিমান, কলালক্ষ্মীর মন্দিরে খুব কম জীবনীকারই হয়তো প্রবেশাধিকার পান, কিন্তু তাতে কী-ই বা আসে যায়! জীবনীকার স্বধর্মে নিযুক্ত থেকে যদি পরম নিষ্ঠা-সহকারে কাজ করে যান, সেটাও এক অর্থে কলালক্ষ্মীরই বন্দনা করা হয়। একজন জীবনীকারের কীর্তি কখনওই একশো ভাগ শিল্পকলা বলে স্বীকৃত হবে না, তার অবস্থান কারিগরি শিল্প আর রসশিল্পের মাঝামাঝি। কিন্তু তবু একজন জীবনীকার আমাদের যা দিয়ে থাকেন তার মূল্য অসীম। সবসময় কল্পনারাজ্যে বিরাজ করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। কল্পনা এমনই এক শক্তি যা নিঃশেষ হয়ে যায় অতি দ্রুত, ক্লান্ত করে ফেলে সেই শক্তির অধিকারীকে। আমাদের ক্লান্ত কল্পনায় কখনওই প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না নিকৃষ্ট কাব্য বা কথাসাহিত্য, বরং আমাদের কল্পনাকে অধিকতর ক্লান্ত ও রক্তশূন্য করে ছাড়ে। কিন্তু জীবনী-সাহিত্য আমাদের চেতনাকে পুষ্টিদান করে সে-জায়গায়। তার সুনির্বাচিত তথ্যসমূহ আমাদের মনে ও মননকে জাগ্রত করে। এই তথ্যসমূহ একজন সার্থক জীবনীকারের হাতে হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক, উর্বর ও আলোকপ্রদায়ী। একটি উৎকৃষ্ট জীবনী পাঠের পর আমাদের মনে থেকে যায় অনেক উজ্জ্বল চিত্রপট, বর্ণময় ব্যক্তিবর্গ, কোনও মানুষের গভীর জীবনবোধ ও প্রগাঢ় প্রত্যয়, যা অবশেষে আমাদের সমৃদ্ধ করে তোলে, আমাদের উন্নীত করে, ঠিক যেমনটি ঘটে থাকে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বা গল্পপাঠের পর।

পাদটীকা

১
ইতিহাস ও জীবনী-সাহিত্যের পার্থক্য সর্বপ্রথম নিরূপণ করেন প্লুটার্ক। প্লেটোর রচনা কিংবা জেনোফনের 'মেমোরাবিলিয়া' থেকে সক্রেটিস-সম্পর্কে অনেক আমরা তথ্য জানতে পারলেও সেগুলি প্রকৃত অর্থে সক্রেটিসের 'জীবনী' নয়। আধুনিক বিচারে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বা বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'ও কতখানি জীবনী-সাহিত্য, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে জীবনী-সাহিত্যের বীজ রোপণ করেন ঐতিহাসিকরাই। প্লুটার্ক, ট্যাসিটাস ও সুটোনিয়াস—এই তিনজন রোমান ঐতিহাসিক আজ স্বীকৃত জীবনী-সাহিত্যের আদিপিতা-রূপে। যুগ্মভাবে সাজানো তেইশজন গ্রীক ও তেইশজন রোমান নৃপতির জীবনী-বর্ণিত প্লুটার্কের 'সমান্তরাল জীবনী' (প্রথম খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে। শেক্সপিয়ারও এই মহান গ্রন্থটির ওপর নির্ভরশীল হন ঐতিহাসিক নাটক-রচনার ক্ষেত্রে। ট্যাসিটাস-রচিত 'ইতিহাস' গ্রন্থে (আনুমানিক ১০৪-১০৯ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণিত গাল্‌বা থেকে ডমিশ্যন

পর্যন্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল। সুটোনিয়াস রচিত 'সিজারদের জীবনী' (জুলিয়াস সিজার থেকে ডমিশ্যন পর্যন্ত) এবং টেরেন্স, হোরেস ও লুকানের জীবনীও সমাদৃত। 'সিজারদের জীবনী' গ্রন্থ হিসেবে সুখপাঠ্য যেহেতু এটি রোমান সম্রাটদের কেচ্ছা-কেলেংকারিতে ভরা, যেগুলির ঐতিহাসিক সত্য প্রাতীত নয়।

২
রেনেসাঁস পর্বে, আত্মজীবনীর মতোই, জীবনী-সাহিত্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ে। দান্তের জীবনী লেখেন বোকাচ্চিও ও ব্রুনি, চোদ্দো শতকের শেষ ভাগে। যোলো শতকে লেখা হয় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য জীবনী স্যর টমাস মোর-এর 'লাইফ অভ জন পিকাস, আর্ল অভ মিরান্দোলা' (১৫১০) এবং 'হিস্ট্রি অভ রিচার্ড দ্য থার্ড' (১৫৪৩, ১৫৫৭); ভাজারির 'চিত্রকরদের জীবনী' (১৫৫০,১৫৬৮); টমাস ক্যাভেনডিশ-এর 'লাইফ অভ কার্ডিনাল ওলসি' (যদি প্রকাশ হয় ১৬৪১-এ) এবং উইলিয়ম রোপর-এর 'দ্য লাইফ অভ স্যর টমাস মোর' (১৫৫৮ সালে লেখা হলেও ১৬২৬-এর আগে প্রকাশ হয় নি)।

এলিজাবিথান পর্বে ইংলন্ডে ধ্রুপদী জীবনীকারদের রচনার কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হয়। সেই সঙ্গে দেখি বেকন-এর 'দ্য হিস্ট্রি অভ হেনরি দ্য সেভেন্থ' (যদিও প্রকাশ হয় ১৬২২ সালে)। প্লুটার্কের মতো বেকনও ইতিহাস ও জীবনী-সাহিত্যের পার্থক্য নিরূপণ করেন।

সতেরো শতকে ইংরেজি জীবনী-সাহিত্য বিকশিত হয় অধিক মাত্রায়। আইজ্যাক ওঅল্টন-রচিত ডন, স্যর হেনরি ওটন, রিচার্ড হুকার, জর্জ হারবার্ট ও রবার্ট স্যান্ডার্সনের জীবনী খ্যাতিলাভ করে (প্রথম চারটি জীবনী একখণ্ডে প্রকাশ হয় ১৬৭০ সালে; পঞ্চমটি প্রকাশ হয় ১৬৭৮-এ)। বিশপ বার্নার-এর 'লাইফ অ্যান্ড ডেথ অভ জন, আর্ল অভ রচেস্টার' (১৬৮০) তুলনামূলকভাবে কম গুত্বপূর্ণ হলেও জীবনী-সাহিত্যের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জীবনী-সাহিত্যের শিল্পরীতি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন ড্রাইডেন, যার প্রমাণ পাই তাঁর লেখা প্লুটার্কের জীবনীতে।

আঠেরো শতকে রচিত দুটি মহান জীবনীগ্রন্থ এই সাহিত্যরীতিকে ব্যাপকরূপে প্রভাবিত করে। জনসনের 'লাইভস অভ পোয়েটস' (১৭৭৯-১৭৮১) এবং বসওয়েলের 'লাইফ অভ জনসন' (১৭৯১) জীবনী-সাহিত্যে অনন্য সাধারণ কীর্তিরূপে বিবেচিত। জনসনের মতো প্রভাব-বিস্তারী ও দীক্ষিত জীবনীকার আজও বিরল—এই কথাটি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়। তাঁর আগে পর্যন্ত জীবনী-সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশই অতি মাত্রায় হীন তোষামোদ ও কিছু ক্ষেত্রে বাছবিচারহীন প্রশংসার ফলে বিনষ্ট হয়।

এ ধরনের 'পুষ্পলতাতুল্য জীবনী'র প্রতি আগ্রহী ছিলেন না জনসন (তাঁর ভাষায় 'honeysuckle lives')। তিনি চাইতেন পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ চরিত্রচিত্রণ। স্যাভেজ-বিষয়ক রচনাটি জনসনীয় ধারণার জীবনী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠদৃষ্টান্ত। বসওয়েল-কৃত জনসনের জীবনীও, অনুরূপভাবে, এই সাহিত্যরীতির অতুলনীয় নিদর্শন। অবশ্য জনসন ও বসওয়েলের বেশ কিছু আগেই ভলতেয়ার রচনা করেন দ্বাদশ শার্ল-এর সুবিখ্যাত জীবনী (১৭৩১)।

এই রচনাগুলিই পথ করে দেয় উনিশ শতকের জীবনী-সাহিত্যের ভাগীরথী ধারার। সাদি-র 'লাইফ অভ জনসন' (১৮১৩), 'লাইফ অভ ওয়েস্‌লি' (১৮২০), লকহার্ট-এর 'লাইফ অভ স্যর ওঅল্টর স্কট' (১৮৩৮) এবং মধ্য ভিক্টোরিয়ান পর্বে কার্লাইল-এর 'দ্য লাইফ অ্যান্ডটাইমস অভ ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট' (১৮৫৮-১৮৬৫), শ্রীমতী গাসকেল-এর 'লাইফ অভ শার্লট ব্রন্টি' (১৮৫৭), ফর্স্টার-এর 'লাইফ অভ চার্লস ডিকেন্স' (১৮৭২-১৮৭৪), ম্যাসন-এর 'মিল্টন' (১৮৫৯-১৮৮০), মর্লি-এর 'ভলতেয়ার' (১৮৭২) ও 'সো' (১৮৭৬) শুচিবায়ুগ্রস্ত পরিবেশের প্রেক্ষিতে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' (১৮৯১), কালীময় ঘটকের 'চরিতাষ্টক' (১৮৬৭),উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (প্রথম-তৃতীয় খণ্ড, ১৮৯১-১৮৯৬), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১), রামগোপাল সান্যালের 'হিন্দুপ্যাট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী' (১৮৮৭), 'বাবু কৃষ্ণদাস পালের জীবনী'(১৮৯০), 'A General Biography of Bengal Celebrities both Living and Dead' •1888— ÛõÑ 'Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India Vol. I + II' (১৮৯৪-১৮৯৫), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'কবির মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদগ্রন্থ সমালোচনা' (১৮৭১), 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত' (১৮৭৭), 'ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত' (১৮৮৬) এবং 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০), রজনীকান্ত গুপ্তের 'জয়দেবচরিত' (১৮৭৩), 'নবচরিত' (১৮৮০), 'কুমারী কার্পেন্টারের জীবনচরিত' (১৮৮২) এবং 'প্রতিভা' (১৮৯৬), রামচন্দ্র দত্তের 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৯০), মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধির 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত' (১৮৮৫), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩), সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' (১৮৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থ দোষে-গুণে মিলিয়ে বাংলা চরিতসাহিত্যের কয়েকটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

৩
জীবনচরিত-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মনোভাব পাত্র-নির্বিশেষে সরব হয়েছে। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০)-তে কিশোরী রানুকে তিনি বলেন "ঐ যে ডাক-

হরকরা আসছে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখতে পাচ্ছি—তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ও দিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেছেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন, সেইসঙ্গে আমাকেও পর্যবেক্ষণ করবেন বলে বোধ হচ্ছে। যখন করবেন তখন হয়তো ঢুলব—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখবেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো—বোলো, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই।” (৪০-সংখ্যক পত্র, ২৮শে পৌষ ১৩২৬)।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com